ফয়যানে মদীনা

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

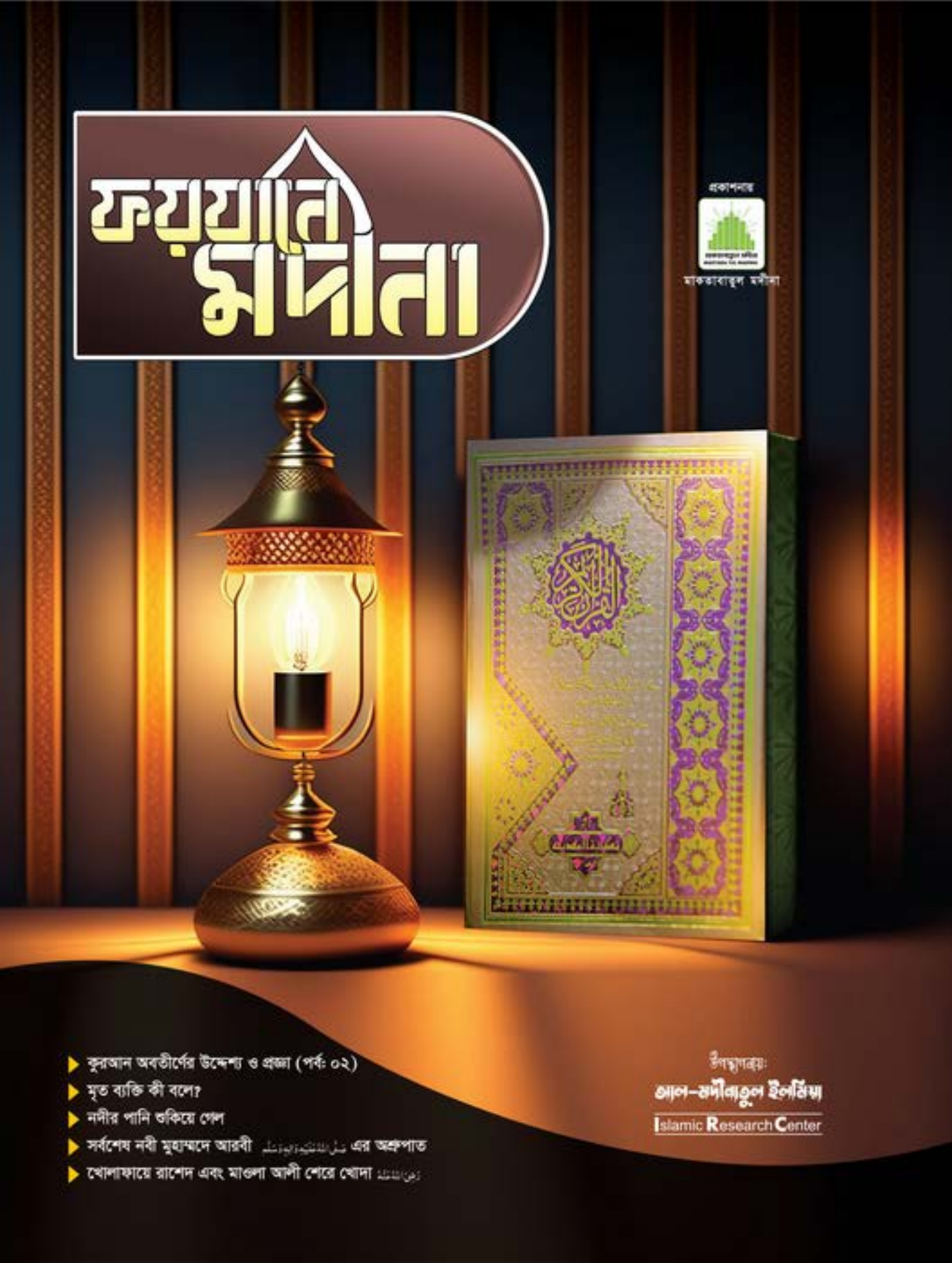

- কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা (পর্ব: ০২)
- মৃত ব্যক্তি কী বলে?
- নদীর পানি শুকিয়ে গেল
- সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী صلى الله عليه وسلم এর অশ্রুপাত
- খোলাফায়ে রাশেদ এবং মাওলা আলী শেরে খোদা رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা (পর্ব: ০২)

মাওলানা রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

সত্য দ্বীনের পূর্ণতা:

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা মায়িদায় আল্লাহ পাকের এই মহান ঘোষণা রয়েছে:

اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম। (পারা: ৬, সূরা মায়িদা: ৩)

সূরা আনআমে ইরশাদ করেন:

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۱۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তাঁর বাণীসমূহের কেউ পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনিই শ্রবণকারী, জ্ঞানী।

(পারা: ৮, সূরা আনআম: ১১৫)

এই আয়াতগুলো বলে দেয় যে, কুরআন অবতীর্ণের সাথে সাথে দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন না কোনো নতুন নবীর প্রয়োজন আছে, না কোনো নতুন কিতাবের, আর না দ্বীনে কোনো প্রকার কমবেশির সুযোগ রয়েছে। কুরআন আকিদা, ইবাদত, লেনদেন, নৈতিকতা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি, পরিবার এবং সমাজের প্রতিটি দিক সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বাণীতে কুরআন করিমের সমস্ত নীতি ও শিক্ষাকে কথায় ও কাজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই দ্বীনের পূর্ণতা আল্লাহর নেয়ামত এবং মুসলমানদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ। এর দাবি হলো যে, আমরা এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে আমাদের জীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করব, এতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করব না এবং অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থাকে এর উপর প্রাধান্য দেব না। সমাজে যখন মানুষ এই সত্যটি বুঝতে পারে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, তখন তারা পশ্চিমা মতবাদ ও চিন্তাধারার দাসত্ব

থেকে বেরিয়ে আসে এবং নিজেদের আসল পরিচয়ে গর্ব করে।

মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরের শক্তি:

কুরআনে করীম পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হওয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। সূরা ফুরকানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿۳۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কাফিরগণ বললো, 'কুরআন তাঁর উপর একবারে কেন অবতারণ করা হলো না?' আমি এভাবেই ক্রমশঃ সেটা অবতীর্ণ করেছি, এ জন্য যে, তা'দ্বারা আপনার হৃদয়কে মজবুত করবো এবং আমি সেটাকে থেমে থেমে পাঠ করেছি।

(পারা: ১৯, সূরা ফুরকান: ৩২)

সূরা হুদেও এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সব কিছু আমি আপনাকে রাসূলগণের সংবাদই শুনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করবো এবং এই সূরায় আপনার নিকট সত্য এসেছে এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ ও নসীহত।

(পারা: ১২, সূরা হুদ: ১২০)

এই আয়াতগুলো বলে দেয় যে, কুরআনের পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হওয়া এবং এতে পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনার উল্লেখ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য অন্তরের শক্তির মাধ্যম ছিল। যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা তীব্র হতো, সমস্যা বাড়ত এবং পরিস্থিতি কঠিন হতো, তখন আল্লাহ পাক ওহী অবতীর্ণ করতেন যা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহস বাড়াত এবং তাঁকে এই বিশ্বাস দিত যে, আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। বিগত নবীদের ধৈর্য ও অবিচলতার ঘটনা শুনে তিনি সান্ত্বনা পেতেন যে, এই পথ সবসময় কঠিন ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় সত্যেরই হয়। এটি আমাদের জন্যও শিক্ষা যে, যখন আমরা দ্বীনের পথে সমস্যার সম্মুখীন হই তখন কুরআনের তিলাওয়াত এবং এর ঘটনাগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করব যাতে আমাদের অন্তর শক্তিশালী হয় এবং আমরা ধৈর্য ও অবিচলতার তৌফিক পাই।

সন্দেহ দূরীকরণ ও সত্যের স্পষ্টিকরণ:

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করতে এবং সত্যকে স্পষ্ট করতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা নাহলে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে মাহবুব! আমি তোমার প্রতি এ 'স্মৃতি' অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদের নিকট বণনা করেন, যা তাদের

প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে চিন্তাভাবনা করে। (পারা: ১৪, সূরা নাহল: ৪৪)

সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ
وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿۹۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি; এবং এগুলোকে অস্বীকার করবে না কিন্তু ফাসিক্ব লোকেরা। (পারা: ১, সূরা বাকারা: ৯৯)

সূরা মায়িদায়ও এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে:

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ
كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে কিতাবীরা! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এর এ রাসূল তাশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন সেসব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা কিতাবের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিলে এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে এটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।

(পারা: ৬, সূরা মায়িদা: ১৫)

কুরআনে করীমের এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি সব ধরনের সন্দেহের উত্তর দেয় এবং আকিদা, শরীয়ত, নৈতিকতা ও ইতিহাস সম্পর্কিত সমস্ত সত্যকে স্পষ্ট করে। নববী যুগে কাফের ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সন্দেহ উপস্থাপন করা হতো, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় বিকৃতির কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত এবং মুশরিকরা তাদের বাতিল আকিদার পক্ষে যুক্তি দিত। কুরআন এই সমস্ত সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত ও স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে। আজও যখন দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে প্রশ্ন তোলা হয় বা নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দেয়, তখন কুরআনই সেই মানদণ্ড যার আলোয় সেগুলোর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সমাজে অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়, কুরআনের শিক্ষায় এই সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায় এবং মানুষের চিন্তায় স্বচ্ছতা আসে।

আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি চিন্তার আহ্বান:

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব মানুষকে মহাবিশ্বে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি চিন্তা করার আহ্বান জানানোর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা স্ব'দে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ
وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, বারাকাতময়; যাতে তারা সেটার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে। (পারা: ২৩, সূরা স্ব'দ: ২৯)

সূরা মুহাম্মদে ইরশাদ করেন:

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? কিন্তু কোন কোন অন্তরের উপর সেগুলোর তালা লেগেছে।

(পারা: ২৬, সূরা মুহাম্মদ: ২৪)

সূরা নিসায়ও ইরশাদ করেন:

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْهِ اخْتِلَافًا كَثِیْرًا ﴿۸۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না কুরআনের মধ্যে? এবং যদি তা খোদা ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হতো তবে তাতে বহু বিরোধ পেতো।

(পারা: ৫, সূরা নিসা: ৮২)

কুরআনের এই দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি মানুষকে চিন্তা ও গবেষণার আহ্বান জানায়। এটি এমন কোনো কিতাব নয়, যা না বুঝে কেবল পড়ে নেওয়া হবে, বরং এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে, এর আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করবে এবং তারপর এর আলোয় নিজের জীবন সাজাবে। কুরআন মহাবিশ্বের নিদর্শনাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, সূর্য ও চাঁদের ব্যবস্থা, বৃষ্টি ও উদ্ভিদ, মানবদেহের গঠন এবং অন্যান্য অসংখ্য সত্যের উল্লেখ করে মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে। সমাজে যখন মানুষ কুরআনের উপর চিন্তা করা ছেড়ে দেয় তখন তারা কেবল আনুষ্ঠানিক তিলাওয়াতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং কুরআনের শিক্ষা তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনে না।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়ন:

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য কুরআনে করীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাব পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর সত্যায়ন করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِیْلَ ﴿۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদির সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন।

(পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান: ৩)

সূরা মায়িদায় ইরশাদ করেন:

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে মাহবূব! আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি পববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে এবং সেগুলোর সংরক্ষক ও সাক্ষীরূপে। (পারা:৬, সূরা মায়িদা: ৪৮)

সূরা বাকারায়ও ইরশাদ করেন:

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۚ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ পাকের সেই কিতাব (ক্বুরআন মাজীদ) এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব (তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে এবং এর পূর্বে তারা সেই নবীর 'ওসীলা' ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো; অতঃপর যখন তাশরীফ এনেছেন তাদের নিকট সেই পরিচিত সত্তা, তখন তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে বসেছে। অতএব, আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত) অস্বীকারকারীদের উপর। (পারাঃ ১, সূরা বাকারাঃ ৮৯)

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে, কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের আসল শিক্ষার সত্যায়ন করেছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই বিষয়গুলোও স্পষ্ট করেছে যা তারা আগে মানত এবং পরে অস্বীকার করে বসেছিল। আহলে কিতাব তাদের আসমানি কিতাবগুলোতে পরিবর্তন করেছে, কিছু অংশ গোপন করেছে, কিছু ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বিধান বদলে দিয়েছে। কুরআন এসে আসল তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাতের আকিদা ও শিক্ষাকে পুনরায় স্পষ্ট করেছে। এটি আমাদের জন্যও শিক্ষা যে, আমরা কুরআনের হেফাযত করব, এতে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি থেকে বাঁচব এবং এটি সেভাবেই সামনে পৌঁছে দেব, যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সমাজে যখন মানুষ কুরআনের শিক্ষাকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করে তখন তারা আসলে সেই ভুলটিই করে যা আহলে কিতাব করেছিল। কুরআনের আসল শিক্ষার ওপর অটল থাকা আমাদের দায়িত্ব।

মৃত ব্যক্তি কী বলে?
(What Does the Deceased Say?)

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী

বুখারী শরীফে রয়েছে: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ، فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِيْ، قَدِّمُوْنِيْ، وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ

অনুবাদ: যখন জানাযা রেখে দেওয়া হয় এবং লোকেরা তা কাঁধে তুলে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি নেককার হয় তবে বলে: আমাকে আগে বাড়াও, আমাকে আগে বাড়াও আর যদি নেককার না হয় তবে বলে: আহ ধ্বংস! তোমরা এই জানাযা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া প্রতিটি বস্তু তার আওয়াজ শুনতে পায়, যদি মানুষ তা শুনত তবে বেহুঁশ হয়ে যেত। (বুখারী, ১/৪৬৫, হাদীস: ১৩৮০)

হাদীসের শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ: "জানাযা" শব্দটি মৃত ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং সেই খাটিয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয় যার ওপর মৃত ব্যক্তিকে উঠানো হয়। (উমদাতুল কারী, ৬/১৫৭, ১৩১৬নং হাদীসের পাদটিকা) উদ্দেশ্য হলো যখন মৃত ব্যক্তিকে মানুষের সামনে খাটিয়ার উপর রেখে দেওয়া হয় যাতে তারা নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যায়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা। মিরআতুল মানাজিহ, ২/৪৬৬)

قَدِّمُوْنِيْ، قَدِّمُوْنِيْ: অর্থাৎ আমাকে দ্রুত আমার ঠিকানায় পৌঁছে দাও, কারণ মৃত ব্যক্তি জান্নাতে তার উচ্চ মর্যাদা দেখতে পায়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা) বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তি কথা বলে কারণ মৃত্যুযন্ত্রণার সময় সে তার ভবিষ্যৎ অবস্থা জেনে যায়। এখন তার এখানে অবস্থান করা কঠিন মনে হয়। তাই বলে: দ্রুত পৌঁছে দাও। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/৪৬৬) হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই ক্ষমতার অধিকারী যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে সেভাবে জীবিত করে দেবেন, যেভাবে কবরে প্রশ্নোত্তরের জন্য জীবিত করবেন এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেও এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, মুনকার-নকির কবরে আসার আগে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: মৃত ব্যক্তি দাফন করে যাওয়া লোকদের জুতার শব্দ শোনে তারপর তার নিকট (মুনকার-নকির) দুই ফেরেশতা

আসে। হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তি তার গোসল প্রদানকারী, বহনকারী, কাফন পরিধানকারী এবং কবরে নামানো ব্যক্তিদের সবাইকে চেনে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা)

يَا وَيۡلَهَا: এর অর্থ হলো: আহ এই জানাযার ধ্বংস। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা) আসলে এটি يَا وَيۡلِي হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ "আহ আমার ধ্বংস" তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কিন্তু এখানে গায়েব সর্বনাম "هَا" আনা হয়েছে কারণ যখন মৃত ব্যক্তি দেখে যে, সে নেককার নয় তখন যেন সে নিজেকে ঘৃণা করে এবং নিজের সত্তাকে জানাযা থেকে আলাদা মনে করে এবং "ধ্বংস"কে নিজের সত্তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা অপছন্দ করে জানাযার ব্যাপারে বলে: তোমরা একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এবং মৃত ব্যক্তি "يَا وَيۡلَهَا" এজন্য বলে যে, সে জানতে পারে যে, সে নেকি আগে পাঠায়নি এবং এখন সে এমন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে যা তার অপছন্দ, তাই সে ওই দিকে যাওয়াকে খারাপ মনে করে।

(দেখুন: উমদাতুল কারী, ৬/১৫৪, ১৩১৪নং হাদীসের পাদটিকা)

يَسۡمَعُ صَوۡتَهَا كُلُّ شَيۡءٍ: তার আওয়াজ প্রতিটি বস্তু শোনে, এমনকি জড় পদার্থও শোনে, একমাত্র মানুষ ছাড়া। মানুষ এই আওয়াজ শুনতে পায় না। এটি এই বিষয়ের স্পষ্ট দলিল যে, এই কথাটি বাস্তবে ঘটে। তবে এটাও হতে পারে যে, এখানে "শোনা" দ্বারা উদ্দেশ্য "বোঝা", যেমনটি কুরআনে করীমে রয়েছে:

وَلٰكِنۡ لَّا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِيۡحَهُمۡ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, তোমরা সেগুলোর তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারো না। (পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৪। মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা)

لَوۡ سَمِعَهَا الۡاِنۡسَانُ لَصَعِقَ: অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি এমন ভয়ংকর আওয়াজে চিৎকার করে যে, যদি কোনো মানুষ তা শোনে তবে বেহুঁশ হয়ে যাবে বা মরে যাবে। (উমদাতুল কারী, ৬/১৫৪, ১৩১৪নং হাদীসের পাদটিকা)। মানুষকে এই আওয়াজ না শোনানোর রহস্য হলো; এমন যেন না হয় যে, দুনিয়ার ব্যবস্থা টিকে থাকবে না এবং ঈমান "অদৃশ্য" এর পরিবর্তে "দৃশ্যের" উপর হয়ে যাবে। এজন্যই বলা হয় যে, যদি দুনিয়ায় বেখবর ও উদাসিন লোক না থাকত তবে দুনিয়ার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত এবং এটাও বলা হয়েছে: উদাসিনতাই মানুষকে দুনিয়া থেকে সফরের জন্য আটকে রাখে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/১৩৩, ১৬৪৭নং হাদীসের পাদটিকা) মিরআতুল মানাজিহতে রয়েছে: "যদি মৃত ব্যক্তির এই আওয়াজ মানুষ শুনে নেয় তবে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে।" মৃত ব্যক্তির এই আওয়াজ পশু, ফেরেশতা, কঙ্কর, পাথর সবাই শোনে। মানুষকে এজন্যই শোনানো হয়নি যে, প্রথমত তার মধ্যে এই আওয়াজ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত তার উপর অদৃশ্যে ঈমান রাখা আবশ্যক। যদি সে আওয়াজ শুনে নেয় তবে অদৃশ্যের উপর ঈমান থাকে না।

(মিরআতুল মানাজিহ, ২/৪৬৭)

সারসংক্ষেপ

নেককার ও সালেহ মানুষ মৃত্যুর পর নিজের শেষ গন্তব্যের দিকে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে, অন্যদিকে গুনাহগার ও বদকার কাফের ব্যক্তি

নিজের আমলের কারণে ভীতি ও আতঙ্কে লিপ্ত থাকে। (ফয়যানে রিয়াযুস সালেহিন, ৪/৫৮৬)

ভাবনার বিষয়

পাঠক! ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ বা ৭০ বছর যতটুকু জীবন কাটানোর ছিল কাটিয়ে নিয়েছি। এখন আর কত মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস বা বছর বাঁচব? তা আমাদের মালিক ও পরওয়ারদিগারই জানেন। প্রয়োজন হলো বর্তমান মুহূর্তে আমরা আমাদের বিগত জীবনের রেকর্ড নিট অ্যান্ড ক্লিন (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করে নিই, আর এর উপায় হলো আমরা আমাদের গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা করে নিই এবং আগামী জীবন সেই হুকুম-আহকামের অধীনে অতিবাহিত করি যা আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দিয়েছেন।

একটি উদাহরণ

যাকে তার ভালো পারফরম্যান্সের উপর পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য স্টেজে ডাকা হয়, সে খুশিতে ফুলে উঠে এবং দ্রুত পায়ে স্টেজের দিকে এগোয়। পক্ষান্তরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হলে তার পা কয়েক মন ওজনের হয়ে যায়, যার কারণে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। কাউকে কাউকে তো কর্মীদের লোকেরা দুই কাঁধে তুলে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যায়। কয়েদির এই অবস্থা এজন্য হয় যে, সে তার পরিণতি দেখতে পাচ্ছে।

কল্পনা করুন:

নিজের মানসিকতা তৈরির জন্য এই হাদীসটি নিজের উপর এভাবে প্রয়োগ করে দেখুন যে, একদিন আপনারও জানাযা উঠবে এবং এরপর দু'টি অপশন থাকবে; (১) আপনি খুশি হয়ে বলবেন; আমাকে আমার কবরের দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, কারণ আপনি আপনার কবরের অবস্থা ভালো, জাঁকজমকপূর্ণ এবং আরামদায়ক দেখতে পাচ্ছেন। অথবা (২) আপনি কাঁদতে কাঁদতে, চিৎকার করতে করতে নিজের পরিবারের লোকজন এবং জানাযা বহনকারীদের বলবেন যে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কারণ আপনি কবরের ভয়াবহতা দেখতে পাচ্ছেন। এই আওয়াজ এতটাই ভয়ংকর হবে যে, যদি অন্য মানুষ শুনে নেয় তবে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তাদের প্রাণও যেতে পারে। তাহলে স্বয়ং আপনার কী অবস্থা হবে?

এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে যে, কোন অপশনটি বেছে নিবেন "আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো" নাকি "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" নিঃসন্দেহে আমাদের প্রত্যেকেই প্রথম অপশনটি বেছে নেবে। এর জন্য আমাদের আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করতে হবে এবং এর জন্য নেক কাজ গ্রহণ করতে হবে এবং গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। এটি সহজ করার জন্য দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করুন, নেক সাহচর্য অবলম্বন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশ এতে অনেক উপকারী, জরুরি এবং সহায়ক। এই ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَاللّٰه সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে।

দোয়া করি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বিনা হিসাবে মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রদান করেন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

(১) তাকবীরে কুনুতে হাত না তোলার হুকুম/ কুনুতে নাযিলার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, (১) যদি নামাযী বিতরের তৃতীয় রাকআতে তাকবীরে কুনুত বলার সময় হাত না তোলে তবে কি তার বিতর সঠিক হয়ে যাবে, নাকি তার উপর বিতর পুনরায় পড়া... বা... সিজদায়ে সাহু করা আবশ্যক হবে?

(২) এবং কুনুতে নাযিলা কী? এবং এতেও কি তাকবীরে কুনুত বলার সময় হাত তুলবে? এই বিষয়েও নির্দেশনা দিন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: (১) বিতরের তৃতীয় রাকআতে দোয়ায়ে কুনুতের আগে তাকবীরে কুনুত বলার সময় হাত তোলা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর সিজদায়ে সাহু নামাযের কোনো ওয়াজিব ভুলবশত ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। অন্যদিকে নামাযের ইয়াদা (পুনরায় পড়া) ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে বা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও না করলে আবশ্যক হয়। নামাযের কোনো সুন্নাত ছেড়ে দিলে না তো সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় আর না নামাযের ইয়াদা ওয়াজিব হয়। তবে সুন্নাত ছাড়ার কারণে নামাযের ইয়াদা করা মুস্তাহাব হয়, সুন্নাত ভুলবশত বর্জিত হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে। মনে রাখবেন! কোনো শরয়ী অপারগতা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেওয়া খারাপ কাজ এবং এটি ছাড়ার অভ্যাস করে নেওয়া নাজায়িয ও গুনাহ।

আরও মনে রাখা দরকার যে, বিতরের কাযা পড়ার সময় মানুষের সামনে তাকবীরে কুনুত বলার সময় হাত তোলা যাবে না, কারণ এতে গুনাহের (অর্থাৎ বিতর কাযা করার) প্রকাশ ঘটে এবং গুনাহের প্রকাশও গুনাহ, যা থেকে বাঁচা শরয়ীভাবে আবশ্যক ও জরুরি।

(২) যখন মুসলমানদের উপর কোনো বড় বিপদ এসে পড়ে তখন ফজরের দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর আগে দোয়ায়ে কুনুত পড়াকে "কুনুতে নাযিলা" বলে। হানাফিদের মতে কোনো বিশেষ বিপদের সময়ই ফজরের দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর আগে কুনুতে নাযিলা পড়ার অনুমতি রয়েছে, সাধারণ অবস্থায় বিতর ছাড়া অন্য কোনো নামাযে কুনুত পড়া যায় না। কুনুতে নাযিলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই, বরং সাধারণ বিপদ ঘটলে যে দোয়া করা হয় সেই দোয়াই করা হবে। যেমন; প্লেগ দেখা দিলে প্লেগ থেকে মুক্তির দোয়া করবে এবং অন্য কোনো মহামারী দেখা দিলে সেই মহামারী থেকে মুক্তির দোয়া করবে। এতে (অর্থাৎ কুনুতে নাযিলায়) তাকবীরে কুনুত বলার সময় হাত তুলবে এবং ইমাম ও মুক্তাদি সবাই আস্তে কুনুত পড়বে। যে মুক্তাদির কুনুত মুখস্থ নেই, সে আস্তে আস্তে আমিন বলতে থাকবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ঋণের উপর লাভের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে কী বলেন যে, আমাদের বড় ভাইয়ের পরামর্শে আমাদের বাবা আমাদের ভাইদের প্রায় ১৫ লাখ টাকা দিয়ে দেন এবং ঠিক হয় যে, বাবার এই টাকা আমরা ভাইয়েরা নিজেদের ব্যক্তিগত জরুরি কাজে ব্যবহার করব এবং যে ভাই যতটুকু টাকা নিয়েছে সে সেই হিসাবে বাবাকে লাভ দিতে থাকবে। তারপর যখন বাবার এই টাকার প্রয়োজন হবে তখন তাকে এই টাকা পুরো ফিরিয়ে দেব। শরয়ী নির্দেশনা দিন যে, এই চুক্তি কি সঠিক? এবং এখন আমাদের জন্য কী হুকুম? এছাড়া এখন পর্যন্ত যে লাভ আমরা ভাইয়েরা বাবাকে দিয়েছি, সে সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কী? এই লাভ সেই মাসিক খরচের অতিরিক্ত যা আমরা ভাইয়েরা বাবাকে আগে থেকেই দিয়ে আসছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত ক্ষেত্রে আপনার বাবা এবং আপনার ভাইদের মধ্যে হওয়া এই চুক্তিটি খাঁটি সুদি চুক্তি। কারণ বাবা যে টাকা আপনার ভাইদের দিয়েছেন, তার শরয়ী মর্যাদা হলো ঋণের এবং ঋণের নিয়ম হলো যে, যতটুকু টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, ততটুকুই ফেরত নেওয়া, আর ঋণের চেয়ে বেশি নেওয়া ঠিক করা হলে তা সুদ হবে, যা নেওয়া-দেওয়া নাজায়িয ও হারাম এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া লানতের কাজ। তাই আপনাদের সবার উপর আবশ্যক যে, অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করা। এছাড়া আপনার বাবা এই টাকার বিনিময়ে যতটুকু অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন, তাঁর উপর আবশ্যক যে, তিনি এই অতিরিক্ত টাকা আপনারা ভাইদের ফেরত দেবেন অথবা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া শরয়ী ফকিরে সদকা করে দেবেন।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) রোযা ছাড়া সুন্নাত ইতিকাফ আদায় হয় না

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম ও শরয়ী মুফতিগণ এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, যেই ব্যক্তি কোনো অপারগতার কারণে রোযা রাখতে পারে না, রোযা রাখা ছাড়া তার ইতিকাফে বসলে রমযানের শেষ দশকের সুন্নাত ইতিকাফ আদায় হয়ে যাবে কি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: রমযান শরীফের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া, পুরো এলাকায় কেউ না করলে সবাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেওয়া এবং মন্দ কাজের অপরাধী হবে এবং যদি একজনও করে নেয় তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর এই ইতিকাফ সঠিক হওয়ার জন্য রোযা শর্ত। তাই যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে না, তার সুন্নাত ইতিকাফ আদায় হবে না।

বিঃদ্রঃ- ইতিকাফের তিন প্রকার। (১) ওয়াজিব অর্থাৎ মান্নতের ইতিকাফ। (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ। এই দুটির জন্য রোযা শর্ত। (৩) নফল ইতিকাফ যা এই দুটির বাইরে, এতে রোযা শর্ত নয় এবং এতে সময়েরও কোনো বাঁধাধরা সীমা নেই। তাই যারা কোনো অপারগতার কারণে রোযা রাখতে পারেন না কিন্তু মসজিদের আদব বজায় রেখে ইতিকাফ করতে পারেন তাদের উচিত যে, যতটুকু সময় পাওয়া যায় মসজিদে নফল ইতিকাফের নিয়তে বসে যাবেন যে, এটিও একটি উত্তম নেকি।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) ইতিকাফকারীর ফিনায়ে মসজিদে সাবান ও টুথপেস্ট ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, সুন্নাত ইতিকাফ চলাকালীন ইতিকাফকারী মসজিদের ওযুখানায় সাবান ও টুথপেস্ট ব্যবহার করতে পারে কি না? অথচ এই ওযুখানা ফিনায়ে মসজিদে অবস্থিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: ইতিকাফকারী যদি ফিনায়ে মসজিদে প্রয়োজন ছাড়াও যায় তবুও ইতিকাফ ভঙ্গ হয় না। কারণ ফিনায়ে মসজিদ এই ব্যাপারে হুকমে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। তাই ফিনায়ে মসজিদে ইতিকাফকারী টুথপেস্ট করল, হাত-মুখ ইত্যাদি ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করল তবে এতে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসার বিধান

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

নাবালক সন্তানের জমি পিতার বিক্রি করার বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, যায়েদ তার নাতি ওমরের জন্মের সময় তাকে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত নিজের একটি জমি উপহার হিসেবে দিয়েছিল। ওমরের বাবা বকর সেই জমির দখলও নিয়ে নিয়েছিল। কিছুদিন আগে বকর তার পুরো পরিবারসহ হায়দ্রাবাদ থেকে করাচিতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। আপনার কাছে জানতে চাই, এই অবস্থায় বকর তার নাবালক সন্তানের সেই জমি বিক্রি করতে পারবে কি?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: শরীয়তের বিধান মনে রাখবেন যে, নাবালক শিশুকে উপহার হিসেবে দেওয়া কোনো জিনিসের ওপর যদি তার অভিভাবক অর্থাৎ বাবা দখল নিয়ে নেন, তবে হেবা (দান) পূর্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই উপহারটি শিশুর মালিকানায় চলে আসে। অতএব জিজ্ঞাসিত ক্ষেত্রে সেই জমির ওপরও শিশুর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তবে বাবা যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী হন অথবা তার অবস্থা গোপন থাকে অর্থাৎ তার ভালো বা খারাপ হওয়া স্পষ্ট না হয়, তবে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি নাবালক সন্তানের মালিকানাধীন জিনিস শরয়ীভাবে বিক্রি করতে পারেন, শর্ত হলো তা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে হবে। অতএব জিজ্ঞাসিত ক্ষেত্রে বকর যদি সৎ বা তার অবস্থা অস্পষ্ট হয়, তবে তার জন্য তার সন্তানের জমি বাজার মূল্যে বিক্রি করা শরয়ীভাবে জায়িয। বিক্রির পর প্রাপ্ত টাকা সেই সন্তানেরই হবে।

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "যায়েদ তার বাড়ি ও দোকান তার স্ত্রীর নামে বিক্রি করেছিল, পরে স্ত্রী ইন্তেকাল করে। যায়েদের তিনজন নাবালক সন্তান তাদের মায়ের ওয়ারিশ। এখন যায়েদের কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে তার এবং নাবালকদের ভরণপোষণ

চলবে। যায়েদ সৎ চরিত্রের, সম্পদ নষ্টকারী নয়। সে সৎ উদ্দেশ্যে নিজের এবং তার নাবালক সন্তানদের অংশ বিক্রি করে ব্যবসা করতে চায়, যাতে তাদের সবার রিযিক আসে। এই অবস্থায় যায়েদের কি সেই অংশগুলো বিক্রি করার অধিকার আছে?" এর উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যদি যায়েদ সৎ চরিত্রের হয় এবং তার দ্বারা সন্তানের সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, আর বিক্রি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে হয়, তবে তার সেই অংশগুলো বিক্রি করার অধিকার রয়েছে।" (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৫/৪৩৬)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: "পিতা যদি নাবালক সন্তানের জমি বিক্রি করে দেয় এবং তার চরিত্র ভালো হয় বা তার অবস্থা গোপন থাকে, তবে বিক্রি সঠিক। আর যদি সে অসৎ চরিত্রের হয় এবং সম্পদ নষ্টকারী হয়, তবে বিক্রি নাজায়িয। অর্থাৎ নাবালক বালেগ হওয়ার পর সেই বিক্রি বাতিল করতে পারে। তবে যদি ভালো দামে বিক্রি করে থাকে, তবে বিক্রি সঠিক।"

(বাহারে শরীয়ত, ২/৮১৪)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এতিম শিশু কি তার সম্পদ কাউকে উপহার দিতে পারে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, যদি কোনো এতিম শিশু খুশি হয়ে নিজের ব্যক্তিগত টাকা থেকে কাউকে উপহার দেয়, তবে কি সেই উপহার গ্রহণ করা জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: নাবালক শিশু যদি নিজের ব্যক্তিগত টাকা থেকে কাউকে উপহার হিসেবে কিছু দেয়, যদিও তা খুশি মনে দেয়, তবুও তা গ্রহণ করা জায়িয নয়। যদি কেউ গ্রহণ করে, তবে তার ওপর আবশ্যক হলো তা নাবালককে ফেরত দেওয়া। আমাদের সমাজে যার বাবা ইন্তেকাল করেছেন তাকে এতিম বলা হয়, যদিও সে বালেগ হয়ে যায়। যদি এই শিশু বালেগ হয়, তবে উপহার দিতে পারে, আর যদি নাবালক হয়, তবে দিতে পারে না।

সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "স্বয়ং শিশুও যদি তার সম্পদ হেবা (দান) করতে চায়, তবে করতে পারবে না। অর্থাৎ যদি সে হেবা করে দেয় এবং গ্রহীতাকে দিয়ে দেয়, তবে তার কাছ থেকে তা ফেরত নেওয়া হবে, কারণ হেবা জায়িযই নয়... নাবালক তার সম্পদ নিজে বা তার বাবাও সদকা করতে পারে না। এটি খুব মনে রাখার বিষয়, কারণ অনেকেই নাবালকের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে ব্যবহার করে ফেলে এবং মনে করে যে সে দিয়ে দিয়েছে, অথচ এই দেওয়া না দেওয়ারই মতো।"

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৮১)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঋণ ক্ষমা করার পর পুনরায় দাবি করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে কী বলেন যে, আমার বন্ধু আমাকে ঋণ দিয়েছিল এবং পরে নিজের ইচ্ছায় সেই ঋণ ক্ষমা করে দেয়। এখন

পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় সে পুনরায় আমার কাছে ঋণ দাবি করছে। জানতে চাই, শরয়ীভাবে আমার ওপর কি ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত ক্ষেত্রে আপনার ওপর সেই ঋণ পরিশোধ করা শরয়ীভাবে আবশ্যক নয়। কারণ দেনা বা ঋণ ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা হয়ে যায়, আর যে দেনা যিম্মা থেকে ক্ষমা হয়ে যায় তা পুনরায় ফিরে আসে না।

ঋণ বা দেনা ক্ষমা করে দিলে ক্ষমা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برئ **অনুবাদ:** যদি কোনো ব্যক্তি তার ঋণগ্রহীতাকে বলে: "যদি আমার তোমার ওপর কোনো ঋণ থাকে তবে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম" এবং বাস্তবে তার ঋণ ছিল, তবে ঋণগ্রহীতা মুক্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার ওপর ঋণ শেষ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুখতার, ৭/৫০৪)

দুররুল হুক্কাম শরহে মাজাল্লাতুল আহকামে আছে:

لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يُسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويُطالبه بالدين؛لأن ذمته برأت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه

অনুবাদ: যদি কারো অন্য কারো ওপর ঋণ থাকে, তারপর সে ঋণগ্রহীতার ওপর থেকে সেই ঋণ ক্ষমা করে দেয় এবং পরে তার মত পরিবর্তন হয় এবং সে ঋণ ক্ষমা করার জন্য অনুতপ্ত হয়, তবে যেহেতু সে ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছে এবং এটি সেই অধিকারগুলোর মধ্যে একটি যা সে ক্ষমা করতে পারে, তাই এখন তার জন্য ঋণগ্রহীতার কাছে পুনরায় ঋণ দাবি করা জায়িয নয়। কারণ ঋণদাতা তার অধিকার ক্ষমা করে দেওয়ায় ঋণগ্রহীতার যিম্মা ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

(দুররুল হুক্কাম শরহে মাজাল্লাতুল আহকাম, ১/৫৪)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শেষ নবীর অনন্য মুজিযা

নদীর পানি শুকিয়ে গেল

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ পাকের কুদরত, সাহায্য এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার আয়না স্বরূপ। তাঁর শৈশবকালেও এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, যা কেবল তাঁর বিশেষ শান ও মর্যাদার সাক্ষ্যই দেয় না বরং আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের সাথে সম্পর্ক, তাঁদের অনুসরণ এবং পূর্ণ বিশ্বাসের দৌলত বান্দার পথ থেকে বাধা সরিয়ে দেয়।

যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স দশ বছরের চেয়ে কিছু বেশি হলো, তখন তিনি তাঁর চাচা জুবাইরের সাথে একটি সফরে বের হলেন। সফরের এক পর্যায়ে কাফেলা এমন এক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে একটি উট পথচারীদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন সেই উটটি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখল তখন বসে পড়ল এবং নিজের বুক (সামনের অংশ) মাটিতে ঘষতে লাগল।

অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উট থেকে নামলেন এবং সেই উটের উপর আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। এমনকি উপত্যকা পার হয়ে গেলে সেই উট থেকে নেমে গেলেন। তারপর যখন কাফেলা সেই সফর থেকে ফিরছিল তখন পথে এমন এক উপত্যকা দিয়ে গেল, যেখানে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল এবং পানির স্রোত তীব্র ছিল। যার কারণে কাফেলার লোকেরা থেমে গেল (কারণ প্রবাহিত পানি সামনে এগোতে বাধা ছিল)। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার পেছনে পেছনে এসো। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বিধাহীনভাবে পানিতে নেমে গেলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এমন হলো যে, পানি তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেল এবং সবাই তাঁর পেছনে পেছনে সেই নদী পার হয়ে গেল। যখন কাফেলার লোকেরা মক্কায় পৌঁছাল তখন এই বিষয়ের আলোচনা করতে লাগল যে, এই ছেলে বড় শান ও মর্যাদাবান। (সীরাতে হালবিয়া, ১/১৭০)

سُبْحٰنَ اللّٰه! আমাদের প্রিয় আক্বা, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব দেখুন যে, পথের বাধা হয়ে দাঁড়ানো উট তাঁকে দেখামাত্রই বসে পড়ল এবং নিজেকে হুযুরে আকরাম سُبْحٰنَ اللّٰه! এর সাওয়ারির জন্য নিজেকে উপস্থাপনও করে দিল। অতঃপর নদী পার হওয়ার সময় পানি শুকিয়ে যাওয়া তো মহান একটি মুজিযা। মুজিযা সম্বলিত এই ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি:

✯ পশুরাও রাসূলে আকরামের প্রতি ভালোবাসা ও আপনত্ব রাখত।

✯ আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শৈশব থেকেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও নিদর্শনাবলী দিয়ে সম্মানিত করেছেন যাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নরা তাঁর শান চিনতে পারে।

✯ পশুদের সাথেও স্নেহপূর্ণ আচরণ করা উচিত এবং পশুর ভালোবাসার জবাব ভালোবাসা পূর্ণ আচরণের মাধ্যমে দেওয়া উচিত।

✯ আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যম বানিয়ে দেন। তাঁরা যেখানে পা রাখেন, সেখানে সমস্যাগুলো নিজেই পথ ছেড়ে দেয়।

✯ আমাদের সাথী ও সহযাত্রীদের কাজে আসা এবং তাদের সমস্যা দূর করা উচিত।

✯ সাফল্যের পথে অন্যদেরও সাথে রেখে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া উচিত।

✯ সফল লোকদের অনুসরণ (Follow) করা সাফল্যের নিশ্চয়তা।

✯ কুদরতে ইলাহির সামনে কোনো বাহ্যিক বাধা অবশিষ্ট থাকে না, তা পশুর অনড়তা হোক বা পানির প্রবাহ, যখন আল্লাহ চান সব বশীভূত (অর্থাৎ অনুগত) হয়ে যায়।

✯ কঠিন সময়ে ঈমানদারদের বাহ্যিক কৌশলের চেয়ে বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুলের সহিত পা বাড়ানো উচিত, কারণ বিশ্বাস পথ খুলে দেয়।

✯ জীবনের বাহ্যিক পথে আল্লাহওয়ালাদের পেছনে চলা যখন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, তখন আমলের পথে তাঁদের পেছনে চলাও নিশ্চিতভাবে সাফল্যের জামিন হবে।

✯ আমাদের গুণী ব্যক্তির গুণ স্বীকার করা উচিত এবং কারোর প্রশংসনীয় বিষয়ের প্রশংসা করা উচিত।

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাম্মদে আরবী এর অশ্রুপাত

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক মানুষকে অনুভূতির নেয়ামত দান করেছেন। এই নেয়ামতের বদৌলতেই মানুষ খুশির সময় হাসে এবং দুঃখের সময় কখনো মনঃক্ষুণ্ন হয়, আবার কখনো কেঁদে দেয়। হাসি এবং কান্না উভয়টিই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। যেমনটি কুরআনে করীমে রয়েছে:

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿۴۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এ যে, তিনিই হন, যিনি হাসিয়েছেন এবং কাঁদিয়েছেন।

(পারা ২৭, সূরা নাজম: ৪৩)

আল্লাহর করুণা দেখুন যে, তিনি কান্নাকে দুঃখের সময় সান্ত্বনা, বিপদের সময় আশ্বাস এবং সাহস হারানো থেকে বাঁচার মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহর রহমত দেখুন যে, তিনি সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সত্তাকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো খুশি এবং দুঃখের মুহূর্তেও আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন। আমাদের দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অশ্রুপাত করে এই উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আসুন! আমরা আমাদের দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশ্রুপাতের ধরন সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি:

নামায চলাকালীন অশ্রুপাত

(১) শেরে খোদা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: বদরের দিন হযরত মিকদাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ছাড়া আমাদের মধ্যে কেউ অশ্বারোহী ছিল না। আমি দেখলাম যে, প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে আছে, আর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের নিচে নামায পড়ছেন এবং কাঁদছেন, এভাবে সকাল হয়ে গেল। (মুসনাদে আহমদ, ২/২৯৯, হাদীস: ১০২৩)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন শিখখির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন এবং কান্নার কারণে তাঁর বুক থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ আসছিল।

(আবু দাউদ, ১/৩৪২, হাদীস: ৯০৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরও প্রিয় নবী, মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আচরণের বরকত নসিব করো। নামাযে কান্নার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা জরুরি:

(১) নামাযী একাগ্রতা অবলম্বন করবে। যেখানে আল্লাহর ন্যায়বিচারের ভয় অন্তরে থাকবে,

সেখানেই তাঁর রহমতের আশাও লেগে থাকবে। (২) জাহান্নামের ভয়ে এবং জান্নাতের আগ্রহে আওয়াজ ছাড়া কাঁদায় কোনো দোষ নেই। (৩) নামায চলাকালীন কান্নার সময় আহ, উহ, উফ, তুফ এই শব্দগুলো ব্যাথা বা বিপদের কারণে বের হলে অথবা শব্দ করে কাঁদল এবং অক্ষর সৃষ্টি হলো, তবে এই সব অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। নামায ভঙ্গের কারণ হলো যে, এভাবে কাঁদা অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয় এবং উদ্দেশ্য এটা জানানো যে, "আমার কষ্ট হচ্ছে বা আমার উপর বিপদ এসেছে।" এটি হলো মানুষের কথা, যা নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

যদি এই শব্দগুলো জান্নাত ও দোযখের স্মরণে বলা হয়, তবে নামায নষ্ট হবে না। কারণ এই অবস্থায় এই শব্দগুলো দোয়া, রহমত প্রার্থনা এবং ক্ষমা চাওয়ার পর্যায়ে পড়ে। এই কারণে নামায ভঙ্গ হবে না। (শরহে আবু দাউদ লীল আইনি, ৪/১২৬, ৮৮১নং হাদীসের পাদটিকা। মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৮২, ১০০০নং হাদীসের পাদটিকা। বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৮)

কুরআন শোনার সময় অশ্রুপাত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন। তিনি অবাক হয়ে আরয করলেন: আমি (কুরআনের) তিলাওয়াত করব? অথচ (এই কুরআন) আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অন্যের কাছ থেকে শোনা আমার ভালো লাগে। সুতরাং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সূরা নিসার তিলাওয়াত করলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছালেন:

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো? এবং হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণ-কারীরূপে উপস্থিত করবো? (পারা: ৫, সূরা নিসা: ৪১)

তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এখন এতটুকুই যথেষ্ট।" (অর্থাৎ পরের আয়াতটি পড়ো না, কারণ আমি এই আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। কান্নাকাটির অবস্থা আমার উপর ছেয়ে আছে, এই অবস্থা আরও তিলাওয়াত শোনায় বাধা হবে।) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি (তিলাওয়াত থামানোর কারণ জানার জন্য) রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে তাকালাম, তখন তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (বুখারী, ৩/৪১৬, হাদীস: ৫০৫০। মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৬৯৪, ২১৯৫নং হাদীসের পাদটিকা। দলিল আল ফালেহিন, ২/৩৬১, ৪৪৬নং হাদীসের পাদটিকা)

কবরস্থানে অশ্রুপাত

হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের পাশে বসলেন এবং এত কাঁদলেন যে, (তাঁর অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল। তারপর ইরশাদ করলেন: يَااِخواني لِمِثْلِ هٰذَا فَأَعِدُّوا অর্থাৎ হে আমার

ভাইয়েরা! এর মতো (কবরের) জন্য (কবরে সাথে যাওয়ার মতো নেকি) প্রস্তুত রাখো। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৬, হাদীস: ৪১৯৫) এই হাদীস পড়ার পর আমাদের কবরস্থানে যাওয়ার ধরন বদলে যাওয়া উচিত।

উম্মতের চিন্তায় অশ্রুপাত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কুরআন পাক থেকে হযরত ইব্রাহিম عَلَیْہِ السَّلَام এর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন:

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে; সুতরাং যে আমার সঙ্গ অবলম্বন করেছে সে তো আমারই; যে আমার কথা অমান্য করেছে, তবে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু। (পারা: ১৩, সূরা ইব্রাহিম: ৩৬) এবং সেই আয়াত তিলাওয়াত করলেন যাতে হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام এর এই বাণী রয়েছে:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(পারা ৭, সূরা মায়েদা: ১১৮)

তখন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কান্না এসে গেল এবং নিজের হাত তুলে দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈলকে ইরশাদ করলেন: "হে জিবরাঈল! আমার হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে যাও, তোমার প্রতিপালক ভালো জানেন তবুও তাঁকে জিজ্ঞাসা করো যে, কী বিষয় তাঁকে কাঁদাচ্ছে।" হযরত জিবরাঈল عَلَیْہِ السَّلَام রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের আরযি জানালেন। আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈলকে ইরশাদ করলেন: তুমি আমার হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে যাও এবং তাঁকে বলো: اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ অর্থাৎ আপনার উম্মতের ক্ষমার ব্যাপারে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে দুঃখিত করব না।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৯, হাদীস: ৪৯৯)

মৃত্যুতে অশ্রুপাত

(১) সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পুত্র হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দুধমা হলেন হযরত খাওলা বিনতে মুনজির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا। তাঁর স্বামীর নাম ছিল বারা বিন আউস আনসারী। তিনি "আবু সাইফ কামার" নামে পরিচিত ছিলেন। (আল লামিউস সাবিহ, ৫/২১৫)। হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: (একবার) আমরা প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে আবু সাইফ কামারের ঘরে গেলাম। তিনি হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দুধপিতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হযরত ইব্রাহিমকে কোলে নিলেন, তাঁকে চুমু দিলেন এবং শুঁকলেন। এরপর আমরা আবার গেলাম যখন ইব্রাহিম শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। (তাঁর এই অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে লাগল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিও (কাঁদছেন অথচ আপনি বিপদে ধৈর্য ধরার এবং মৃত ব্যক্তির জন্য না কাঁদার নির্দেশ দিয়েছেন)? তিনি ইরশাদ করলেন: হে ইবনে আউফ! (এই কান্না অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতার জন্য নয় বরং) এটি রহমত (যা প্রত্যেক পিতার তার সন্তানের প্রতি থাকে)। তারপর আবার অশ্রু বের হলো তো বললেন: নিশ্চয়ই চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে, মনও দুঃখিত, কিন্তু আমরা শুধু তাই বলব যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন। এবং হে ইব্রাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা দুঃখিত। (বুখারী, ১/৪৪১, হাদীস: ১৩০৩। মিনহাতুল বারি, ৩/৩৭৭, ১৩০৩নং হাদীসের পাদটিকা)

(২) রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কন্যা হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে তাশরিফ আনলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা এবং হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও সাথে ছিলেন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর নাতনিকে দেওয়া হলো। সেই সময় বাচ্চাটির শ্বাস আটকে আসছিল। এটা দেখে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। হযরত সা'দ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী? তিনি ইরশাদ করলেন: هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ অর্থাৎ এটি সেই রহমত যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের অন্তরে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন। (বুখারী, ৪/৫৩২, হাদীস: ৭৩৭৭)

শিক্ষার অশ্রুপাতের ফলাফল ও প্রভাব

চিন্তা করুন যে, আমাদের প্রতিপালক কত করুণা করেছেন, আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার আঁচলের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে অনেক কিছু দিয়েছে। মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশ্রু থেকে ফয়েয পেয়ে অন্তরকে কোমলতা, বেদনা, স্নেহ ও অনুভূতির মতো গুণাবলীতে সজ্জিত করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এই ফয়েয তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন এবং উলামা ও সালেহীনদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামের আলোকিত শিক্ষা প্রতিটি স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়েছে। মোস্তফার ধরন থেকে প্রাপ্ত অশ্রুপাতের শিক্ষা আজও দুনিয়া থেকে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা দূর করার জন্য কার্যকর, দায়িত্ববোধ জাগাতে সহায়ক, মানুষকে ইতিবাচক চিন্তার প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্যকারী এবং সামাজিক অসংবেদনশীলতা থেকে সৃষ্ট ভয়াবহতা থেকে বের করার পথ। এখানে বলা জরুরি যে, দাওয়াতে ইসলামীর উন্নতি ও সাফল্যের অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে দরস ও বয়ান, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজের মাধ্যমে মোস্তফার ধরন থেকে প্রাপ্ত অশ্রুপাতের শিক্ষার

ভূমিকা অত্যন্ত মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াতে ইসলামীতে শেখানো হয় যে:

رونا مصیبت کا مت رو تُو پیارے نبی کے دیوانے
کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تُو نے دھیان کیا

রোনা মুসিবত কা মত রো তু
পেয়ারে নবী কে দিওয়ানে
করব ও বালা ওয়ালে শাহজাদোঁ
পর ভি তু নে ধেয়ান কিয়া

আল্লাহর দরবারে এভাবে ফরিয়াদ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়:

یارب! غمِ حبیب میں رونا نصیب ہو
آنسو نہ رائیگاں ہوں غمِ روزگار میں

ইয়ারব! গমে হাবিবে রোনা নসিব হো
আঁসু না রায়েগাঁ হোঁ গমে রোযগার মেঁ

মোস্তফার দরবারে এভাবে আরয করার আদব শেখানো হয়:

رونا بھی سیکھا دو اور سِکھلا دو تڑپنا بھی
بُلوا کے شہنشاہِ اَبرار مدینے میں

রোনা ভি সিখা দো আউর সিখলা দো তড়পনা ভি
বুলওয়া কে শাহানশাহে আবরার মদীনে মেঁ

খোদাভীতি এবং ইশকে মোস্তফায় কাঁদার গুরুত্ব এভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়:

رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں
ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں

রোনে ওয়ালি আঁখে মাঙ্গো
রোনা সব কা কাম নেহি
যিকরে মুহাব্বাত আম হে লেকিন
সোযে মুহাব্বাত আম নেহি

খোদাভীতি, ইশকে মোস্তফা, আখিরাতের চিন্তায় কাঁদার মতো চোখ যার অর্জিত হয়ে যায় এবং তারপর সে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রেরণা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নামে, তখন আল্লাহ পাকের দয়ায় উন্নতি ও সাফল্য তাকে স্বাগত জানায়।

খোলাফায়ে রাশেদ এবং মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

(সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা)

মাওলানা আদনান আহমেদ আত্তারী মাদানী

ইসলামী ইতিহাসের সোনালী পাতায় এমন একটি অধ্যায় রয়েছে, যা নবুওয়াতের সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। যেখানে খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্তরে ঈমানের আলো, ভালোবাসার সাগর এবং ভ্রাতৃত্বের ফুল ফুটে থাকতে দেখা যায়। এটিই সেই পবিত্র সময় ছিল, যখন অন্তরে পারস্পরিক শ্রদ্ধার মহত্ত্ব, শুভাকাঙ্ক্ষার প্রদীপ এবং ভ্রাতৃত্বের সুগন্ধি পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শেরে খোদা, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সেই ঈমানোদীপ্ত, প্রজ্ঞাময় এবং সাহসী পদক্ষেপগুলো পাঠযোগ্য, যা তিনি খোলাফায়ে সালাসার (তিন খলিফার) মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায়, তাঁদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের শরয়ী সমর্থন এবং উম্মতের ঐক্যের স্বার্থে নিয়েছিলেন। এগুলো সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা মুসলমানদের সারিতে একতা বজায় রেখেছিল, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছিল এবং ফিতনা সৃষ্টিকারীদের দমন করার দায়িত্ব পালন করেছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাইয়াত ও সমর্থন:

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খলিফা হওয়ার তিন দিন পর বললেন: “কেউ আছে কি, যে আমার বাইয়াত বাতিল করে পদত্যাগ ও বিচ্ছেদ চায়, যাতে আমি তাকে (বাইয়াতের বাধ্যবাধকতা থেকে) অব্যাহতি দিতে পারি?” তখন মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “আল্লাহর কসম! আমরা না আপনাকে এই পদ থেকে পদত্যাগ ও ইস্তফা দিতে বাধ্য করব, আর না আপনার কাছে ইস্তফা ও পদত্যাগের দাবি করব। কে সেই (সাহসী ও শক্তিশালী), যে আপনাকে পেছনে ফেলবে অথচ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনাকে সামনে বাড়িয়েছেন?” (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩০৬)

সিদ্দিকী খেলাফতের সত্য হওয়ার সমর্থন এবং মুনাফিকদের খণ্ডন:

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের শুরুতে এক গোত্রনেতা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে এল এবং আরয করল: "হে আলী এবং হে আব্বাস! কী কারণে এই খেলাফত কুরাইশের সবচেয়ে দুর্বল ও কম সংখ্যার গোত্রে চলে গেল?" এতে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে) বললেন: "যদি আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে এর যোগ্য মনে না করতাম তবে আমরা তাঁকে খেলাফত অর্পণ করতাম না। নিঃসন্দেহে মুমিনরা একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে, যদিও তাদের ঘর ও শরীর দূরে হয়, আর নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা একে অপরকে ধোঁকা দেয়।" (কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৫, ৩/২৬২, হাদীস: ১৪১৫২)

খলিফায়ে ওয়াক্তের সুরক্ষার চিন্তা ও দূরদর্শিতা:

যখন কিছু লোক যাকাত অস্বীকার করল এবং মুরতাদ হয়ে গেল, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ময়দানে বের হতে লাগলেন। তখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর বাহনের লাগাম ধরে আরয করলেন: "হে খলিফায়ে রাসূল! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনাকে সেই কথাই বলছি, যা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনাকে উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: আপনার তলোয়ার খাপে রাখুন এবং আমাদের আপনার প্রাণের শোকে ফেলবেন না এবং মদীনায় ফিরে যান। আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনার শোকে নিপতিত হই তবে আপনার পর ইসলামের ব্যবস্থা আর কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।"

(কানযুল উম্মাল, ৩/২৬২, হাদীস: ১৪১৫৪)

সিদ্দিকী ও ফারুকী খেলাফতকে প্রমাণ ও ভিত্তি সাব্যস্ত করা:

এক সময় মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উভয়কে পরবর্তীতে আগত সমস্ত শাসকের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ ও পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন। আল্লাহ পাকের কসম! এই দুজন (নিজেদের খেলাফতের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করতে) অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন (যেখানে অন্যরা পৌঁছাতে পারে না) এবং এই দুজন পবিত্র সত্তা তাঁদের পরে আগতদের অনেক ক্লান্ত করে দিয়েছেন।"

(মানাকিবে আমিরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব লিইবনি জাওজি, পৃষ্ঠা: ৪২)

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই বাণী খোলাফায়ে রাশেদার ব্যবস্থা এবং সর্বোত্তম শাসন পদ্ধতির গুরুত্বের ওপর একটি দস্তখত ও সিলমোহরের মর্যাদা রাখে।

শাইখাইনের (আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর) শানে বেয়াদবি কারীর জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলাদের জন্য একটি কঠোর নৈতিক ও আইনি সীমানা ঘোষণা করেছিলেন। একবার কেউ আরয করল: "হে আমিরুল মুমিনীন! আমি এমন এক দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা সিদ্দীকে

আকবর ও ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আলোচনা এমনভাবে করছিল, যা ইসলামে জায়িয নয়।" এটা শুনে মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: "কায়েনাতের স্রষ্টার কসম! কেবল খাঁটি মুমিনই এই দুজনকে ভালোবাসবে এবং হতভাগা ও বেদিনই এদের ঘৃণা ও বিরোধিতা করবে। কারণ এদের ভালোবাসা নৈকট্য (প্রকৃত ঈমান) এবং এদের প্রতি ঘৃণা বেদ্বীনী। লোকদের কী হয়েছে যে তারা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দুই ভাই, উজির, বন্ধু, কুরাইশের সর্দার এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক পিতামাতার এমনভাবে আলোচনা করছে। (তারপর মাওলা আলী বেয়াদবদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন:) আমি প্রত্যেক সেই ব্যক্তি থেকে বিমুখ, যে এদের এমন খারাপভাবে উল্লেখ করে এবং আমি তাকে শাস্তি দেব।"

(মানাকিবে আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব লিইবনি জাওজি, পৃষ্ঠা: ৪২)

একবার সিদ্দীকে আকবর এবং ফারুকে আযমের ইজ্জত ও সম্মান পাহারা দিতে গিয়ে এভাবে বললেন: "রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অগ্রগামী হয়েছেন, তারপর হযরত আবু বকর দ্বিতীয় হয়েছেন এবং ওমর ফারুক তৃতীয় হয়েছেন। যদি আমি এমন কোনো ব্যক্তিকে পাই যে, আমাকে আবু বকর এবং ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয় তবে আমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দাতার শাস্তি হিসেবে ৮০ চাবুক মারব এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।"

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ১৩, ৭/৬, হাদীস: ৩৬০৯৭)

ফারুকী খেলাফতের সিদ্ধান্তগুলো বহাল রাখা:

মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খোলাফায়ে সালাসার যুগে কেবল নয় বরং তাঁদের পরেও তাঁদের সাথে ভালোবাসা ও আদবের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁদের সঠিক পদক্ষেপগুলোর সমর্থন ও অনুমোদনও করেছিলেন। যেমনটি আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নাজরানবাসীদের নির্বাসিত করেছিলেন। মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতকালে সেই লোকেরা তাঁর দরবারে হাজির হলো এবং আরয করল:"হে আমিরুল মুমিনীন! এখন দাপ্তরিক কার্যক্রম আপনার হাতে, আগেও আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাদের জমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন, আপনি আমাদের পুনরায় ফিরে আসার অনুমতি দিন।" এটা শুনে মাওলা আলী শেরে খোদা (ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সিদ্ধান্তের পক্ষে বলে এবং একে সঠিক সাব্যস্ত করে) বললেন: "তোমাদের ধ্বংস হোক, নিশ্চয়ই হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদম সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ছিলেন এবং মনে রেখো! হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমি তাতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন করব না।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ১৭/৬৫, হাদীস: ৩২৬৬৭)

ফারুকী চুক্তি বহাল রাখা:

হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন কুফায় তাশরিফ আনলেন তখন বললেন: "আমি এজন্য আসিনি যে, সেই চুক্তি ভাঙব যা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ করেছিলেন, আমি তা কক্ষনো ভাঙব না।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, ১৭/৬৫, হাদীস: ৩২৬৬৮)

ফারুকী যুগ এবং মাওলা আলীর পরামর্শমূলক সেবা:

একবার হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য নিজে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর কাছে পরামর্শ চাইলেন: "আপনাদের কী মত যে, আমি এখান থেকে কিছু লোককে সাথে নিয়ে যাই এবং সেখানে কাছে কোনো স্থানে অবস্থান করে ইসলামী বাহিনী একত্রিত করি এবং মুসলমানদের সাহায্য করি যতক্ষণ না আল্লাহ পাক মুসলমানদের বিজয় দান করেন।" অধিকাংশ সাহাবী আরয করলেন: "আমাদের মত এটা নয় (যে আপনি তাদের কাছে চলে যান), হ্যাঁ! আপনার পরামর্শ ও মত তাদের থেকে দূরে নয় (অর্থাৎ তাদের কাজে আসবে)। লড়ার জন্য আরবের অশ্বারোহী এবং যোদ্ধা ও বাহাদুররাই যথেষ্ট, এই লোকেরাই শত্রুর বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় দিয়েছে।" কিছু সাহাবী عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই মতের সমালোচনা করলেন। তারপর হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন: "অধিকাংশ সাহাবী যে মত দিয়েছেন তা সঠিক। যুদ্ধে জয়-পরাজয় সংখ্যার কম বা বেশির উপর নির্ভর করে না। এটি তো আল্লাহর দ্বীন যাকে তিনি বিজয়ী করেছেন এবং এরই বাহিনী যাকে তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। এমনকি ইসলামী বাহিনী এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমরা তো আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা করি, তিনিই তাঁর ওয়াদা পূরণকারী এবং তাঁর বাহিনীর সাহায্যকারী।" (তারিখে তাবারী, ৪/১২৩ থেকে ১২৪)

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উসমানী বাইয়াত এবং ফাসাদ প্রতিরোধ:

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তৃতীয় খলিফায়ে রাশেদ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কেবল বাইয়াতই আগে করেননি বরং ফাসাদি দলগুলোকে মদীনা পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় আটকে এবং তাদের ভর্ৎসনা করে এক মহান সেবা এবং কার্যকর প্রতিরোধের প্রদর্শন করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মত হলো যে, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাইয়াতকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন। একবার মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে খবর পৌঁছাল যে, আব্দুল্লাহ বিন সাবা, যে আসলে ইয়েমেনের এক ইহুদি ছিল, একটি দল নিয়ে মদীনার দিকে আসছে যাতে মানুষকে খলিফা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে উসকে দেয় (এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে)। তখন হযরত আলী হযরত উসমানের কাছে আরয করলেন: "আমি আপনাকে এই (ফাসাদি) লোকদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখব।" তারপর হযরত আলী এই ফাসাদিদের সাথে রাস্তায় জুহফা নামক স্থানে দেখা করলেন, তাদের খুব বকাবকি করলেন, ভর্ৎসনা করলেন এবং ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এই লোকেরা লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

(ফিকহুস সিরাহ লিল বুতি, ৫৪০ থেকে ৫৪১)

উসমানী যুগে মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা:

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেখানে একজন সেরা পরামর্শদাতা এবং প্রশাসনিক বিষয়ে গভীর দৃষ্টি

রাখতেন, সেখানেই একজন সেরা রাষ্ট্রদূত হওয়ার যোগ্যতায়ও সমৃদ্ধ ছিলেন।

যখন মিশরবাসীরা জুহফায় এল এবং হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর আপত্তি তুলল, তখন হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মিম্বরে বসলেন এবং বললেন: "হে প্রিয় নবীর সাহাবীরা! আমাকে খারাপ বানানো হচ্ছে, মন্দ ছড়ানো হচ্ছে, নেকি লুকানো হচ্ছে, আমার ব্যাপারে অজ্ঞ লোকদের বোকা বানানো হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে এই লোকদের কাছে যাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট এবং কী চায়?" শেরে খোদা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন: "আমি (এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি)।" এটা দেখে হযরত উসমান বললেন: "আপনি তাদের বেশি চেনেনও এবং তাদের জিজ্ঞাসা করার বেশি অধিকারও রাখেন।" হযরত মাওলা আলী (হযরত উসমানের রাষ্ট্রদূত হয়ে) মিশরবাসীদের কাছে গেলেন। তখন তারা তাঁকে স্বাগত জানাল এবং বলল: "আমাদের কাছে আপনার চেয়ে বেশি কোনো প্রিয় ব্যক্তি আসেনি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কোন কথায় অসন্তুষ্ট এবং তোমাদের অভিযোগগুলো কী?" তারা তাদের অভিযোগগুলো জানাল। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/২৪৯) মাওলা আলী কূটনৈতিক দিকটি সামনে রাখলেন এবং চুপচাপ ঐ লোকদের অভিযোগগুলো নিয়ে হযরত উসমানের কাছে পৌঁছালেন। তখন হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওই লোকদের জবাব পাঠালেন (মাওলা আলী হযরত উসমান গণীর জবাবগুলো ওই লোকদের কাছে সুন্দরভাবে পৌঁছে দিলেন)। তখন লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং খুশি খুশি মদীনায় প্রবেশ করল। এবং হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এ বিষয়ে বসরা ও কুফাবাসীদেরও চিঠি লিখে দিলেন যে, যে ব্যক্তি মদীনা উপস্থিত হতে পারবে না সে যেন (কাউকে এখানে মদীনায়) নিজের উকিল নিযুক্ত করে দেয় (এবং যে অভিযোগ থাকে সমাধান করে নেয়)।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/২৪৯)

এই সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইতিহাসের পাতায় শত শত এমন ঘটনা এবং উদাহরণ রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খোলাফায়ে সালাসার প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল এবং তিনি তাঁদের কতটা সম্মান করতেন এবং তাঁদের খেলাফতকালেও দ্বীনি সেবার জন্য অগ্রগামী থাকতেন। শেরে খোদার এই উজ্জ্বল সেবা এবং ঈমানোদীপ্ত পদক্ষেপ উম্মতে মুসলিমার জন্য এক আলোকিত প্রদীপ এবং চিরকাল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি খোলাফায়ে সালাসার বাইয়াত, সমর্থন, প্রতিরক্ষা এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের অনুমোদনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, উম্মতের ঐক্য এবং খোলাফায়ে রাশেদার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছিলেন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের খোলাফায়ে রাশেদিনের ভালোবাসায় সিক্ত করুক এবং আখিরাতে তাঁদের নৈকট্য ও উসিলা দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

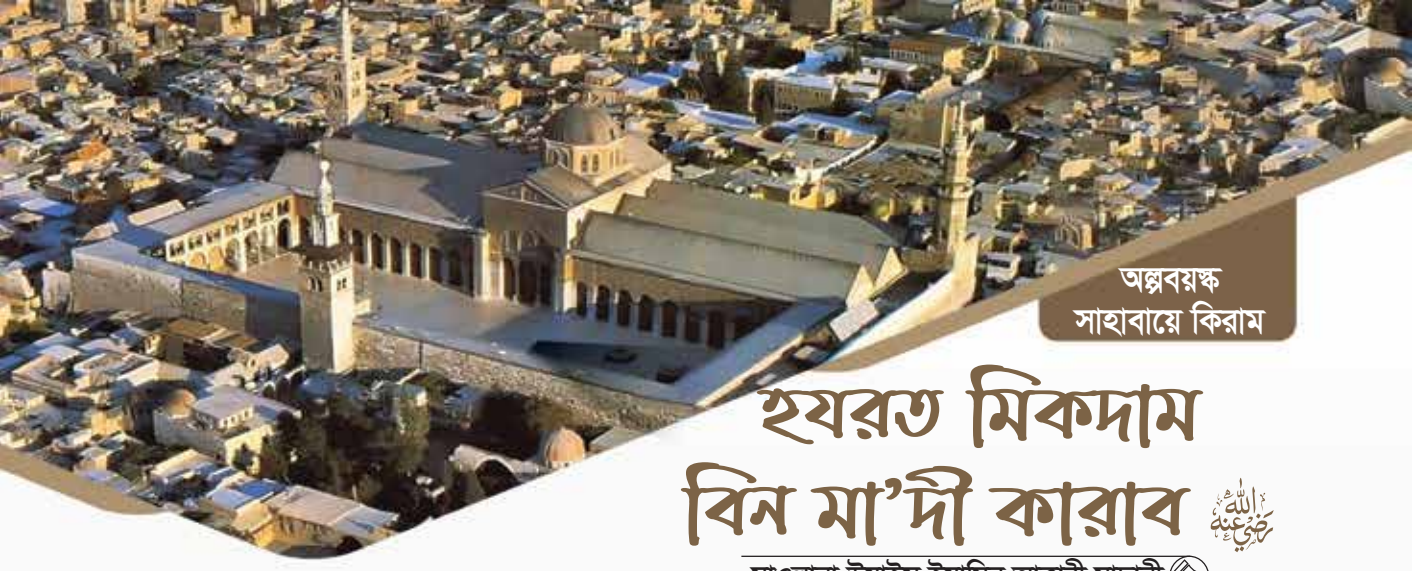

অল্পবয়স্ক
সাহাবায়ে কিরাম

হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

মাওলানা উয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

অল্প বয়সে যেসকল সৌভাগ্যবান শিশু আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদে মোস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব رَضِیَ اللہُ عَنْہُও অন্তর্ভুক্ত। আসুন! তাঁর শৈশব সম্পর্কে পড়ে আমাদের হৃদয় সাহাবায়ে কিরামের ভালোবাসায় আলোকিত করি:

তাঁকে অল্পবয়স্ক সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।
(ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার, ৫/২৬৩)

হুযুর কাঁধে হাত রাখলেন:

একবার রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কাঁধে হাত মারলেন এবং তাঁকে یَا قُدَیْمُ বলে সম্বোধন করলেন। (দেখুন: আবু দাউদ, ৩/১৮৩, হাদীস: ২৯৩৩)

মনে রাখবেন, এই হাত মারা এমন ছিল না, যেমন আমাদের এখানে অসভ্যতার সহিত একে অপরকে মারা হয়। বরং এটি ছিল নম্রতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যেমনটি বিখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ এর ব্যাখ্যায় একে হাত রাখা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেন: কাঁধে হাত রাখা এবং কুদাইম বলে ছোট করে সম্বোধন করা দয়া ও ভালোবাসার জন্য। (মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৩৬১)

প্রতিনিধি দলের সাথে হুযুরের দরবারে উপস্থিতি:

তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বনু কিনদাহ এর সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা হুযুর صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল।
(আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪/৪৪)

রেওয়ায়েতের সংখ্যা:

তাঁর থেকে ৪৭টি হাদীস বর্ণিত আছে।
(তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৪১৫)

শস্য মেপে নাও:

তাঁর থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের শস্য মেপে নাও, তোমাকে তাতে বরকত দেওয়া হবে। (বুখারী, ২/২৭, হাদীস: ২১২৮)

মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ বলেন: অর্থাৎ শস্য যখন রাখবে তখন মেপে রাখো এবং যখন খরচের জন্য বের করবে তখন মেপে বের করো, আল্লাহ পাক তাতে বরকত দেবেন।
(নুজহাতুল ক্বারি, ৩/৪৮৪)

ওফাত:

হুযুরে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ আনুমানিক ১৪ বছর বয়সের ছিলেন। কারণ তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ৯১ বছর বয়সে ৮৭ হিজরিতে সিরিয়ায় ওফাত লাভ করেন।
(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৭/২৯০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া

প্রশ্ন: শবে বরাতেই কি কবরস্থানে যাওয়া জরুরি?

উত্তর: শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়াকে সুন্নাত লিখেছেন। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/২৯০)। সারা বছর দিন-রাত যখনই কবরস্থানে যান, নিষেধ নেই।

(দেখুন: মাদানী মুযাকারা, ১২ শা'বান শরীফ ১৪৪৪ হিজরি)

(২) রোযাদারের নিজের থুতু গলায় গিলা কেমন?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় নিজের থুতু গিললে কি রোযা ভেঙে যায়?

উত্তর: নিজের থুতু নিজেই গলায় নেমে গেলো বা ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ! থুতু হাতের তালুতে নিয়ে তারপর গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৭ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

(৩) বিতরের দ্বিতীয় রাকাআতে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে ফেললে...

প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকে কোনো ব্যক্তি বিতরের দ্বিতীয় রাকাআতে শরিক হলো এবং তৃতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে নিল, তবে কি সে তার তৃতীয় রাকাআতে আবার দোয়ায়ে কুনুত পড়বে?

উত্তর: দ্বিতীয় রাকাআতে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে ফেললে তৃতীয় রাকাআতে পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং কোনো সূরা মিলিয়ে নামায পূর্ণ করে নিবে।

(গুনিয়াতুল মুতামাল্লি, পৃষ্ঠা: ৪২১। মাদানী মুযাকারা, ১০ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

(৪) রোযার অবস্থায় ভাপ নেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: রোযার অবস্থায় কি স্টিম অর্থাৎ ভাপ নেওয়া যাবে?

উত্তর: জি না! রোযার অবস্থায় ভাপ নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৮ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

(৫) ফুফুকে যাকাত দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ফুফুকে কি যাকাত দেওয়া যাবে?

উত্তর: যদি যাকাতের হকদার হন তবে দেওয়া যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৭ রমযানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরি)

(৬) সালাতুত তাসবিহ নামাযে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে কী করবেন?

প্রশ্ন: সালাতুত তাসবিহ নামাযে যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায় তবে কি এই সিজদাগুলোতেও তাসবিহ পড়বে?

উত্তর: বাহারে শরীয়তে রয়েছে: (সালাতুত তাসবিহ নামাযে) যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় এবং সিজদা করে তবে এই দুই সিজদাতে তাসবিহ পড়তে হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৪। মাদানী মুযাকারা, ০৭ রবিউস সানি ১৪৪১ হিজরি)

(৭) মৃত ব্যক্তিদের উপর ফিতরা ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিদের ফিতরাও কি দেওয়া যাবে?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিদের উপর ফিতরা ওয়াজিব হয় না। তবে যদি তাদের জীবনে তাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব ছিল এবং তারা আদায় করেনি তবে এখন যদি সন্তান তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয় তবে আল্লাহ পাকের রহমতে কবুলিয়াতের আশা করা যেতে পারে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৫ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

(৮) কুরআন পাককে শহীদ বলা কেমন?

প্রশ্ন: যখন কোনো সাধারণ বইয়ের পাতা আলাদা হয় তখন তাকে ছেঁড়া বলে এবং যখন কুরআন পাকের কোনো পাতা আলাদা হয় তখন তাকে শহীদ হয়ে যাওয়া বলা হয়। এমন বলা কি ঠিক?

উত্তর: নিঃসন্দেহে এটি আদবের কথা এবং এটাই উপযুক্ত। যখন কোনো ভবন ভেঙে ফেলা হয় বা নিজেই ধসে পড়ে তখন তাকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া বলা হয় এবং যখন এই কথাটি কোনো মসজিদের জন্য আসে তখন আদবের সাথে তাকে শহীদ হয়ে যাওয়া বলা হয়। বেয়াদব বদনসিব, বা-আদব বানসিব। শহীদ আদবপূর্ণ শব্দ এবং এটি আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

(৯) কোনো পীর থেকে তালিব হওয়ার সময় "তালিব" শব্দ বলতে ভুলে গেলে?

প্রশ্ন: নিজের পীর সাহেব ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তালিব হওয়ার সময় যদি কেউ এই কথাটি বলতে ভুলে যায় যে "আমি তালিব হচ্ছি!" তবে কি প্রথম বাইয়াত ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর: জি না! বরং আগের পীর সাহেবেরই মুরিদ থাকবে, কারণ বাইয়াত ভঙ্গ করার নিয়ত ছিল না। (মাদানী মুযাকারা, ১৩ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরি)

(১০) ওলী হওয়ার দোয়া করা কেমন?

প্রশ্ন: নিজের ছেলেকে আল্লাহর ওলী বানানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর: ওলী, আল্লাহ পাকের দানে হয়, চেষ্টায় হয় না যে, "আমি চেষ্টা করব এবং এটা এটা করে নেব যাতে ওলী হয়ে যাই।" বেলায়ত ওয়াহবি অর্থাৎ দান করা বিষয়, কাসবি (অর্জন করা বিষয়) নয়। (দেখুন: ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২১/৬০৬)। অর্থাৎ চেষ্টায় মেলে না। তবে এই দোয়া করতে পারেন যে, "আমার ছেলে ওলী হয়ে যাক।" যদি আপনার ওলী হওয়ার শখ থাকে তবে নিজের জন্যও দোয়া করে নিন যে, "আমরা বাপ-বেটা ওলী হয়ে যাই, বরং আমাদের সারা খানদান ওলী হয়ে যাক।" এই দোয়া করাতে কোনো দোষ নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ১৭ মুহাররামুল হারাম ১৪৪২ হিজরি)

(১১) নারীদের ইশরাক ও চাশতের নফল পড়া

প্রশ্ন: নারীরা কি ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করতে পারে?

উত্তর: জি অবশ্যই আদায় করতে পারে।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ জুমাদাল উলা ১৪৪৫ হিজরি)

(১২) জায়নামাযকে পা দিয়ে ভাঁজ করা কেমন?

প্রশ্ন: জায়নামাযকে পা দিয়ে ভাঁজ করা কেমন?

উত্তর: নামায পড়ার পর জায়নামাযকে পা দিয়ে ভাঁজ করা উপযুক্ত নয়। যদি কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে তবে ঝুঁকে ভাঁজ করা উচিত। এমনিতেও ঝুঁকা এক ধরনের ব্যায়াম যা বান্দার জন্য উপকারী। যখন আপনি নামায পড়ার সময় সিজদা করেছেন তখন একটু ঝুঁকে জায়নামাযও ভাঁজ করে দিন।

(মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি)

(১৩) শিশুর জন্মের চুল না কাটা কেমন?

প্রশ্ন: শিশুর জন্মের পর তার চুল না কাটালে কি গুনাহ হয়?

উত্তর: শিশুর জন্মের চুল কাটানো সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা এবং সাওয়াবের কাজ। (দেখুন: বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৫)। যদি না কাটায় তবে কোনো গুনাহ নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হিজরি)

(১৪) ঘরে মাকড়সার জাল কি ঝগড়ার কারণ হয়?

প্রশ্ন: লোকেরা বলে: "ঘরের দেয়ালে লাগা মাকড়সার জাল ঘরে ঝগড়ার কারণ হয়", এই কথা কি ঠিক?

উত্তর: এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন, আমি এমন কোথাও পড়িনি। মনে রাখবেন! ঘরের দেয়ালে লাগা জাল পরিষ্কার না করা গুনাহ নয়, তবে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত নতুবা ঘরে অভাব ও দারিদ্র্য আসে। (তালীমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা: ১২৫। মাদানী মুযাকারা, ১৩ রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি)

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

(১) নারীর পর্দা করে কবরস্থানে যাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম ও শরয়ী মুফতিগণ এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, নারী কি পর্দা করে কবরস্থানে যেতে পারবে, নাকি পারবে না? আজকাল কিছু নারীর পক্ষ থেকে এই মত ব্যক্ত করা হয় যে, যদি কোনো নারী শরয়ী পর্দার পূর্ণ অনুসরণ করে, তবে এই অবস্থায় তার কবরস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। এর উপর একটি রেওয়ায়েতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কবরে যেতেন। এ থেকে প্রমাণ করা হয় যে, নারী যদি শরয়ী দাবিগুলোর খেয়াল রাখে তবে তার জন্য কবরস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। নির্দেশনা দিন যে, এই রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল গ্রহণ করা সঠিক কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওযা মোবারক ছাড়া সাধারণ কবরের যিয়ারতের জন্য যাওয়া নারীদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, যদিও পর্দা করে যাক। আলেমরা বলেছেন যে, নারীর জন্য জুম্মা রহিত, জানাযার নামায এবং জামাআতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং যখন নারীকে এই সমস্ত ইবাদতের জন্য বের হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা শরীয়তে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তখন তার কবরস্থানে যাওয়া আরও বেশি নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে।

আর যেখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর রেওয়ায়েতের সম্পর্ক, তাতে রয়েছে যে, তিনি হজের সফরের সময় তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কবরের যিয়ারত করেছিলেন। এই যিয়ারত ঘর থেকে বিশেষভাবে কবরস্থানে গিয়ে করেননি, বরং সফরের মধ্যে ঘটনাক্রমে হয়েছিল এবং এই আকস্মিক যিয়ারতের সুযোগ ছিল, শর্ত হলো তা শরয়ী নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে নারীদের জন্য ফিতনা, বিলাপ, অধৈর্য এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত যিয়ারতের সম্ভাবনা বিরল বরং নেই বললেই চলে।

তাই ফকিহগণ এই যুগে আকস্মিক যিয়ারতকেও নিষেধ করেছেন। সুতরাং এখন নারীদের জন্য কবর যিয়ারত সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) শিশুদের গাল বা কপালে কালো বিন্দু লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম ও শরয়ী মুফতিগণ এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, বদনযর থেকে বাঁচার জন্য শিশুদের গাল বা কপালে কালো বিন্দু লাগানো কেমন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শিশুদের বদনযর থেকে বাঁচানোর জন্য কপাল, চিবুক বা গালে কালো বিন্দু লাগানো জায়িয। কারণ এটি বদনযর থেকে বাঁচার উপায় যা শরীয়ত বিরোধী নয় এবং এমন কাজ যা শরীয়তের বিরোধী নয় এবং অভিজ্ঞতা থেকে উপকারী হওয়া প্রমাণিত, তা জায়িয। যেমন; আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, যার নযর লাগত তার হাত-পা ধুয়ে নযর লাগা ব্যক্তিকে ছিটা দিত এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ থেকে নিষেধ করেননি। বরং শিশুদের বদনযর থেকে বাঁচানোর জন্য চিবুকে কালো বিন্দু লাগানোর প্রমাণ তো হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর আমল থেকেও প্রমাণিত। তাই এতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেয়েদের সাহরী ও ইফতারের আদব শেখান

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

পারিবারিক ব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত্তি এবং ঘরের পরিবেশের সৌন্দর্যে মেয়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে রমযানুল মোবারকের মতো পবিত্র মাসে যখন ঘরে ঘরে ইবাদত, কল্যাণকামিতা, বরকত এবং আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহরী ও ইফতারের নিয়মাবলী আরও গুরুত্ব পায়। এমতাবস্থায় মা-বাবার দায়িত্ব হলো মেয়েদের শুধু রোযা রাখার গুরুত্বই জানানো নয়, বরং সাহরী ও ইফতারের প্রস্তুতির আদব, বিন্যাস, শিষ্টাচার এবং কৌশলও শেখানো, যাতে আগামী প্রজন্মগুলোতেও দ্বীন ও সংস্কৃতির এই সুন্দর ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকে।

সাহরী ও ইফতারের প্রশিক্ষণ কেন জরুরি?

সাহরী ও ইফতারের আয়োজন শুধু খাওয়া-দাওয়ার বিষয় নয়, বরং এটি শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, মেহমানদারি, কৃতজ্ঞতা এবং ত্যাগের মতো গুণাবলী বিকশিত করার মাধ্যম। মেয়ে যখন সাহরী ও ইফতারের প্রস্তুতি শেখে, তখন সে ভবিষ্যতে নিজের জীবনে এই সুন্দর আমল স্থানান্তরিত করে। এতে ঘরে ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং দ্বীনি পরিবেশ বজায় থাকে।

সাহরীর আয়োজন, কৌশল এবং বিন্যাস:

সাহরীর সময়টি বরকতময় সময়। তাই মেয়েদের এই অনুভূতি দেওয়া উচিত যে, তারা যেন দ্রুত উঠার অভ্যস্ত হয়। মা মেয়েকে আরামের সাথে নিজের সাথে জাগাবেন। মেয়ে যদি না উঠে বা আলস্য দেখায়, তবে চিৎকার-চেঁচামেচি না করে কৌশল অবলম্বন করবেন। প্রথম দিনেই প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে কঠোরতা দেখাবেন না, এতে মেয়ে হতাশ হতে পারে। এর জন্য রমযানুল মোবারক আসার আগেই অল্প অল্প করে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে দিন যাতে মেয়ে মানসিকভাবেও প্রস্তুত হয় এবং আগ্রহও তৈরি হয়। সর্বপ্রথম সাহরী তৈরির আগে এতটা আগে উঠুন যাতে ধীরস্থিরভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারেন। তারপর মেয়ের বয়স অনুযায়ী কাজ ভাগ করে নিন। উদাহরণস্বরূপ মেয়ে যদি এত ছোট হয় যে, রান্নায় সহযোগিতা করতে পারে না, তবে তাকে নিজের কাছে বসান, ভালো ভালো কথা বলুন এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস আনাতে

বলুন, পানির বোতল/জগ ভরতে দিন, দস্তরখানায় খাবার সাজাতে দিন, ঘরের অন্য সদস্যদের জাগাতে বলুন আর মেয়ে যদি কিছুটা বড় হয়, তবে চা বানাতে বলুন, আপনি ভাত রান্না করে নিন ইত্যাদি আর এই সবকিছুর মাঝে কিছু অবহেলা হলে হট্টগোল, বকাবকি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকুন, বরং কাজ খারাপ হলে সঠিক পদ্ধতি বলে দিন। মেয়ে যখন মাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সাহরী বানাতে দেখবে, তখন তার ভেতরেও এমন ধৈর্য ও সহনশীলতা তৈরি হবে। এর বিপরীতে যদি মা নিজেই একদম শেষ সময়ে উঠেন, সময়ের অভাবে মেয়েকে উঠানোর জন্য রান্নাঘর থেকেই শোরগোল করতে থাকেন, চিৎকার-চেঁচামেচি করেন আর যখন মেয়ে উঠবে তখন মাকে রাগান্বিত অবস্থায় কাজ করতে দেখবে, তাড়াহুড়ো করে কাজ করছে, এক চুলায় চা রাখা তো আরেকটিতে ভাত হচ্ছে, চায়ের দিকে নজর দিলে ভাত পুড়ে যাচ্ছে, ভাতের দিকে নজর দিলে চা উথলে পড়ে যাচ্ছে, এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে, বাড়ির অন্যদের উঠাতে গিয়ে ঘরের পরিবেশ আরও অশান্তির শিকার হচ্ছে, যখন মেয়ে সাহরী বানাবে তখন তার ধরনও স্বাভাবিকভাবে এমনই হবে। অথচ প্রথম পদ্ধতিতে আমল করলে অনেক উন্নতি এবং পরিবর্তনশীল শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ হবে। ঘরের পরিবেশ কখনোই খারাপ হতে দিবেন না, বাড়ির লোকদের খেয়াল রাখুন এবং সেহেরির প্রস্তুতিতে পরিচ্ছন্নতা দেখান। সাহরীর সময় বাড়ির লোকদের সামনে হেসে খাবার রাখেন। তবে এই প্রশিক্ষণে মেয়েদের মধ্যে ধৈর্য, সেবা এবং মন জয় করার মতো উচ্চ গুণাবলী তৈরি হবে।

ইফতারের আদবঃ

মেয়েদের শেখান যে, সময়ের আগে প্রস্তুতি নিতে হবে, শোরগোল না করে সুন্নাতে ভরা মিষ্টি কথায় কথা বলতে বলতে কাজ করবে। মেয়েকে তার বয়স অনুযায়ী কাজ দিন। যদি ছুরি সাবধানে ব্যবহার করতে পারে তবে ফল কাটার কাজ তার দায়িত্বে দিন, শরবত বানানো, বোতল ভরা, দস্তরখানা সাজানো, ইফতারের পর সব গোছানো, বাসন ধোয়া, সামলানো ইত্যাদি। রাঁধতে জানলে পাশে বসে খাবার বানাতে বলুন। সাধারণত ইফতারে এমন সব খাবার তৈরি হয় যা সাধারণ দিনে হয় না, তাই মেয়েকে নানা ধরনের খাবার বানানো শেখান। ইফতারের প্রস্তুতিতে পুরো মাস মাল্টি-টাস্কিং হয়, তা কীভাবে সামলাতে হবে শেখান। ঘরে কার কী পছন্দ এবং কী পছন্দ নয় তাও নজরে রাখুন। কোন জিনিস রান্নার জন্য তার ভারসাম্য কী হবে এই বিষয়েও প্রশিক্ষণ দিন। লবণ-মরিচ কীভাবে ব্যালেন্স রাখতে হবে এটি ইফতারের সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার কারণে কোথাও না কোথাও ঝগড়াঝাঁটিও দেখা যায়। ইফতার যা দোয়া কবুলের সময় কিন্তু আফসোস অনেক ঘরে সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়ে থাকে, এটি থেকে বাঁচা উচিত। মেয়েকে শেখান যে, ইফতারের দস্তরখানা সাজানোর সময় পানি এবং খেজুর সবার আগে সামনে রাখতে হবে।

আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশিক্ষণ:

মেয়েদের এটাও শেখানো উচিত যে, সাহরী ও ইফতার শুধু খাওয়ার নাম নয় বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাদের দোয়া, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিন। ইফতারের প্রস্তুতির সময় নামাযের ওয়াক্তে আগে নামায আদায় করতে হবে। ইফতারের মুহূর্তগুলোতে করা দোয়া কবুলের মর্যাদা রাখে, তাই এই মুহূর্তগুলো যিকির ও দোয়া দিয়ে সাজাতে শেখান। একইভাবে তাদের কুরআন পাক তিলাওয়াত, নফল এবং নেকির অন্যান্য কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করুন যাতে রমযান তাদের জন্য আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাস প্রমাণিত হয়। মেয়েদের সাহরী ও ইফতারের আদব শেখানো আসলে একটি সুন্দর দ্বীনি এবং নৈতিক দায়িত্ব। এই প্রশিক্ষণ শুধু খাবার প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মাধ্যমে লজ্জা, সেবা, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং দ্বীন প্রেমের মতো গুণাবলী তাদের ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়। যেই মেয়ে আজ তার মায়ের কাছ থেকে সাহরী ও ইফতারের আদব শেখে, সে কাল একটি ঘরে আলো, শান্তি এবং রহমতের মাধ্যম হয়। এই প্রশিক্ষণই প্রজন্মকে সাজায় এবং ইসলামি সংস্কৃতিকে জীবিত রাখে। মনে রাখবেন! এই সব কাজে মেয়ের যেই প্রশিক্ষণ করতে হবে তাতে মেয়ের আগ্রহ ও প্রেরণা বাড়াতে হবে, তার উপর কাজ চাপিয়ে দিবেন না যে, সে কাজ জানে না অথচ জোর করে করাচ্ছেন। এভাবে মেয়ে কাজের প্রতি বিরক্ত হবে এবং বোঝা মনে করবে, মন থেকে আগ্রহ ও একাগ্রতার সাথে কাজ করবে না। মেয়ের কাজ শেখানোর সময় প্রশিক্ষণের মাঝে আগে সেই কাজের আগ্রহ তৈরি করাতে হবে। আগ্রহে আগ্রহে মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই পুরো ঘর আদবের সাথে সামলানো শিখে যায়, অথচ বিরক্তি এবং বোঝা মনে করে বড় বয়সি হয়েও সে আদব আনতে পারে না এবং কাজ থেকে মুক্তি পেতে চায়।

সাহরী ও ইফতারে সতর্কতা শেখান:

মেয়েদের শেখান যে সাহরী ও ইফতারে অপচয়, লোক দেখানো বা অহেতুক রান্নার আধিক্য থেকে বাঁচা উচিত। মেয়েদের শেখান যে, সাহরীতে হালকা এবং উপকারী খাবার বেশি ভালো, যেমন; দুধ, খেজুর, ফল, ডিম, চিড়া ইত্যাদি। খুব বেশি ঝাল মসলা বা লবণযুক্ত খাবার রোযার সময় পানির ঘাটতি বাড়াতে পারে এবং রক্তচাপের রোগীদের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য, বয়স এবং রোযাদারের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী সাহরী ও ইফতারে এই জিনিসগু লোর ব্যবহারে পার্থক্য হতে পারে।

ইফতারে সতর্কতা:

ইফতারের সময় পাকোড়া, সমুসা, ভাজাভুজি এবং কোল্ড ড্রিংকস ইত্যাদি সাধারণত বেশি খাওয়া হয়। কিন্তু পুষ্টিবিদদের মত হলো রমযানে সুস্থ থাকার জন্য এগুলোর পরিমাণ এবং ধরনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ভাজা (fried) এবং বেশি চর্বিযুক্ত খাবার, যেমন; সমুসা, পাকোড়া ইত্যাদি রোযার পর হজমে চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি, বদহজম

ও অলসতা বা ওজন বাড়ার কারণ হতে পারে। কোল্ড ড্রিংকস এবং বেশি চিনি (sugar) বা প্রক্রিয়াজাত (processed) উপাদান সমৃদ্ধ জিনিস ওজন বৃদ্ধি, শক্তির (energy) হঠাৎ উঠানামা এবং পাকস্থলীর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু সাধারণ এবং উপকারী জিনিস ইফতারের জন্য যথেষ্ট।

রমযানুল মোবারকে নিজের ঘরে মাদানী চ্যানেল অবশ্যই চালু রাখুন বিশেষ করে সাহরী ও ইফতারের সময়গুলোতে। আসরের পর এবং ইশার পর হওয়া মাদানী মুযাকারাও দেখতে ভুলবেন না। এতে আকিদা এবং শরয়ি মাসায়েলের পাশাপাশি ঘরোয়া সমস্যা এবং এর সমাধান, সন্তানের প্রশিক্ষণ, স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের দিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ে খুব উপকারী নির্দেশনা এবং পরামর্শ পাওয়া যায়, যার উপর আমল করলে ঘরের পরিবেশে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়।

রোযা তাকওয়ার প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক সুযোগ

মাওলানা সৈয়দ বাহরাম হুসাইন আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপর যেসব ইবাদত আবশ্যক করা হয়েছে, তা আদায় করা এবং যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার মধ্যে মানুষের নিজেরই উপকার ও কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۙ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যদি তোমরা সৎকর্ম করো, তবে নিজেদেরই কল্যাণ করবে এবং মন্দ করলে নিজেদের।

(পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাইল: ৭)

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালায়, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় আল্লাহ বেপরোয়া সমগ্র জাহান থেকে। (পারা: ২০, সূরা আনকাবুত: ৬)

আল্লাহ পাক আমাদের ইবাদত থেকে অমুখাপেক্ষী, কেউ ইবাদত করুক বা না করুক তাঁর শানে কোনো কমতি হবে না। আমরা ইবাদতের মুখাপেক্ষী কারণ এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাকওয়া ও পরহেযগারি অর্জন করি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۲۱

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! (তোমরা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; এ আশা করে যে, তোমাদের পরহেয্গারী অর্জিত হবে। (পারা: ১, সূরা বাকারা: ২১)

মনে রাখবেন! রোযা শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নাম নয় বরং এটি তাকওয়ার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করে। রমযানে বান্দা তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নফসকে আল্লাহ পাকের আদেশের প্রতি আমল করার অনুশীলন করায় এবং এই অবিরাম প্রচেষ্টা তার ভেতরে তাকওয়া, ধৈর্য এবং পরহেযগারির প্রেরণাকে শক্তিশালী করে। এভাবে রোযা মানুষকে ব্যবহারিক ভাবে তাকওয়ার প্রকৃত রুহ বুঝতে এবং তা তার জীবনে বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেয়।

রোযার ফরয হওয়ার পাশাপাশি এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বিশেষভাবে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

(পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে পাকের আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: রোযার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া ও পরহেজগারি অর্জন। রোযায় যেহেতু নফসের প্রতি কঠোরতা করা হয় এবং পানাহারের হালাল বস্তু থেকেও বারণ করে দেওয়া হয়, তাই এতে নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন হয়। যা দ্বারা নফসকে সংযত রাখা এবং হারাম থেকে বাঁচার শক্তি অর্জিত হয় এবং এই আত্মসংযম এবং ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ সেই মৌলিক বিষয় যার মাধ্যমে মানুষ গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (সিরাতুল জিনান, ১/২৯০) এ কারণেই যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তাদের রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমনটি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে যুবকরা! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে বিবাহ করুক, কারণ এটি পরনারীর দিকে তাকানো থেকে দৃষ্টিকে অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং যার বিবাহের সামর্থ্য নেই সে রোযা রাখুক, কারণ রোযা কামভাব দমনকারী। (বুখারী, ৩/৪২২, হাদীস: ৫০৬৬)

রোযা ব্যবহারিকভাবে রোযাদারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। রোযাদার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করে, তার সামনে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার ও পানীয়, ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত উপস্থিত থাকে কিন্তু সে গোপনেও এই জিনিসগুলোর দিকে হাত বাড়ায় না, কারণ সে জানে যে, তার এই কাজ সৃষ্টির কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে কিন্তু স্রষ্টার কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। তাই এই খোদাভীতি এবং তাকওয়া ও পরহেযগারির প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক সুযোগ রোযার বরকতেই অর্জিত হয়। অতঃপর এই প্রশিক্ষণের প্রভাব এভাবে প্রকাশ পায় যে, মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন এক হয়ে যায়। মানুষ যেভাবে মানুষের সামনে গুনাহ থেকে বিরত থাকে ঠিক সেভাবে নির্জনেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ করুন:

হযরত নাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তাঁর কিছু সঙ্গীর সাথে সফরে ছিলেন। পথে এক জায়গায় থামলেন এবং খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছালেন। ইতিমধ্যে

এক রাখাল (ছাগল চরানো ব্যক্তি) সেখানে এল। তিনি বললেন: এসো! দস্তরখানা থেকে কিছু নিয়ে নাও! সে আরয করল: আমি রোযাদার। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বললেন: তুমি কি এই প্রচণ্ড গরমের দিনে (নফল) রোযা রেখেছ অথচ তুমি এই পাহাড়গুলোতে ছাগল চরাচ্ছ! সে বলল: আল্লাহর কসম! আমি এটা এজন্য করছি যাতে জীবনের গত হওয়া দিনগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারি। তিনি তার পরহেযগারির পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছায় বললেন: তুমি কি তোমার ছাগলগুলোর মধ্যে একটি ছাগল আমাদের কাছে বিক্রি করবে? এর দাম এবং মাংসও তোমাকে দেব যাতে তুমি তা দিয়ে রোযার ইফতার করতে পারো। সে উত্তর দিল: এই ছাগলগুলো আমার নয়, আমার মালিকের। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا পরীক্ষা করার জন্য বললেন: মালিককে বলে দিও যে, নেকড়ে (Wolf) সেগুলোর মধ্য থেকে একটিকে নিয়ে গেছে। গোলাম বলল: তবে আল্লাহ পাক কোথায়? (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তো দেখছেন, তিনি এর জন্য আমাকে ধরবেন)। যখন তিনি মদীনায় ফিরে এলেন তখন তার মালিকের কাছ থেকে গোলাম এবং সব ছাগল কিনে নিলেন, অতঃপর রাখালকে আযাদ করে দিলেন এবং ছাগলগুলোও তাকে উপহার দিয়ে দিলেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩২৯, হাদীস: ৫২৯১)

রোযা মানুষের তাকওয়া ও পরহেযগারি এবং গুনাহ থেকে বিরাগের প্রশিক্ষণ দিয়ে এভাবেও অনুভূতি জাগায় যে, পানাহারের বস্তু যা রোযা ছাড়া জায়িয ছিল কিন্তু রোযার অবস্থায় তা থেকেও নিষেধ করে দেওয়া হলো, তবে সেই জিনিসগুলো যা রোযা ছাড়াও সবসময় নিষিদ্ধ (যেমন; মিথ্যা, গিবত, চোগলখুরি, গালিগালাজ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা এবং কু-দৃষ্টি ইত্যাদি) সেগুলোতে কীভাবে লিপ্ত হওয়া যেতে পারে! তো এভাবে মানুষ রোযার বরকতে পানাহার ইত্যাদি থেকে বাঁচার পাশাপাশি অন্যান্য গুনাহ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে সফল হয়ে যায়।

একইভাবে রোযা এই অনুভূতিও জাগায় যে, যেভাবে রোযাদার পানাহারের জিনিসগুলোর উপর ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের প্রতিপালকের ভয়ে সেগুলো ছেড়ে দেয়, ঠিক সেভাবে গুনাহের উপকরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের প্রতিপালকের ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দেবে যে, এটাই প্রকৃত তাকওয়া এবং এর বড় ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো হারাম কাজের উপর সক্ষম, অতঃপর সে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের ভয়ে তা ছেড়ে দেয় তবে আল্লাহ পাক আখিরাতের আগে দুনিয়াতেই দ্রুত তার এমন বিনিময় দান করেন, যা সেই হারাম কাজের চেয়ে উত্তম। (জামেউল আহাদিস, ৯/৪৩, হাদীস: ২৭০৫২)

মোটকথা রোযা এমন এক অবস্থা যাতে মানুষ সবসময় ইবাদতে থাকে। রোযাদারের সাহরী করা ইবাদত, ইফতার করা ইবাদত এমনকি তার ঘুমানোও ইবাদতে গণ্য হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: রোযাদারের ঘুম ইবাদত, তার নীরবতা তাসবিহ পাঠ, তার দোয়া কবুল এবং তার আমল মকবুল হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৫, হাদীস: ৩৯৩৮) এভাবে মানুষের মুত্তাকি এবং পরহেযগার হওয়ার ক্ষেত্রে রোযার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনায়

সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে

ফয়যানে রমযান

Whatsapp -এ মাকতাবাতুল মদীনার সকল আপডেটকৃত পোস্ট ও ভিডিও পেতে **QR code** স্ক্যান করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh